ন • য়ে • শা • তে • ল

পুলিশ ফ্রাঙ্কেনস্টাইন

সারা দুনিয়া জুড়েই পুলিশ জনসাধারণের বন্ধু। কিন্তু বাংলাদেশে এই চিত্র কিছুটা ভিন্ন। সময়ের সঙ্গে পুলিশ বাহিনীকেও হতে হবে আরো আধুনিক... লিখেছেন সুইজারল্যান্ড থেকে **মো: আশরাফুজ্জামান**

'অর্থ বা অন্য কোনো অবৈধ উৎকোচ দিয়ে কোনো অপরাধী কর্তব্যরত পুলিশের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে এমন তথ্য আমার জীবনে শুনিনি'– উক্তিটি আমার এক ফরাসি পদার্থবিদ বন্ধুর সঙ্গে আমাদের এক একান্ত আলাপচারিতায়। বন্ধুটি হয়তো অত্যুক্তি করতেও পারেন কিছুটা কিন্তু ইউরোপীয় সভ্যতায় এটিই স্বাভাবিক। এখানে প্রতিটি মানুষ তার স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে যেমন সচেতন, তেমনি নিষ্ঠাবান। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার মূল দায়িত্ব সারা দুনিয়ায় প্রতিটি দেশের স্ব স্ব পুলিশ বাহিনীর। একটি দেশের কেন্দ্রে অবস্থিত সরকার আইন প্রণয়ন করে আর তা মেনে চলার দায়িত্ব প্রতিটি নাগরিকের। আর তার যথার্থ প্রয়োগ নিশ্চিত করার দায়িত্ব থাকে পুলিশ বাহিনীর হাতে। উন্নত দেশগুলোতে পুলিশ আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করতে যেমন সুকঠিন, তেমনি যেকোনো বিপদে মানুষের সুসহায়কও বটে। ইউরোপে দেখেছি, আপনি ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন করলে ট্রাফিক পুলিশ আপনাকে জরিমানা করবে তৎক্ষণাৎ। এ প্রসঙ্গে আমার আর এক বন্ধু যিনি সুইস কেন্দ্রীয় পুলিশের একজন উচ্চ কর্মকর্তা। তার কথা এমন– কেন্দ্রীয় পুলিশ তা সে যত বড় কর্তাই হোক না কেন, ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনে তারও জরিমানা সাধারণ নাগরিকের মতোই দিতে হবে এমনকি সে যদি পুলিশের গাড়িতেও চলে। এরকম অবস্থা কি ভাবা যাবে আমাদের এই জনবহুল দেশের পুলিশ ভাইদের কাছ থেকে? তারা কি পেরেছে কখনও জনগণের বন্ধু হতে? বাংলাদেশে এখন যে অবস্থা তাতে মানুষ বিপদে পড়লে প্রথমে নিজে চেষ্টা করে তা প্রতিরোধের। আর ব্যর্থ হলে চুপচাপ বিপদ হজম করে। কারণ তারা জানে পুলিশ কত ভয়ঙ্কর। দেশে এখন টপ টেরর, ডাকাত, চোরাচালানি, সন্ত্রাসী– এরাই পুলিশের বড় বন্ধু, সাধারণ মানুষ নয়। অথচ দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন– এই তাদের দায়িত্ব। কিন্তু অবস্থা ঠিক উল্টো। দেশে পুলিশে চাকরি একটা লোভনীয় পেশা অবৈধ অর্থ প্রাপ্তির কারণে। অথচ সমাজে তাদের গ্রহণযোগ্যতা শূন্যের কোঠায়। আর যতটুকু দেখা যায় তা তাদের প্রতি জনগণের বীতশ্রদ্ধ ঘৃণা আর ভয়ের জন্য। এ অবস্থা দিন দিন এত ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে যে, এদেশের মানুষ এখন পুলিশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে শুরু করেছে। আর তাই সাধারণ মানুষকে পুলিশ যেমন যথেষ্ট আক্রমণ করে, তারাও এখন সচরাচর উদ্বুদ্ধ জনতার রোষে আক্রান্ত এমনকি নিহতও হতে শুরু করেছে, যা একটা সমাজে ধ্বংসের ষোলোকলা পূর্ণের ১৬তম কলাই বৈকি। তাই এ ব্যাপারে দেশ ও জাতির স্বার্থে আমাদের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীকে নিয়ে এখনই সুচিন্ত পরিকল্পনা একান্ত প্রয়োজন। পুলিশে সকল পর্যায়ে নিয়োগে যত না স্বাস্থ্য, উচ্চতা পরীক্ষা করা হয়, তার পাশাপাশি মেধার দিকে অধিক মনোযোগী হতে হবে। এক্ষেত্রে সেনাবাহিনী যে পদ্ধতিতে অতিরিক্ত যাচাই-বাছাই করে, আইকিউ তথা অন্যান্য দিকে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করে সঠিক নিয়োগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এই নিয়োগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ দলীয় প্রভাবমুক্ত রাখতে যথাসাধ্য ব্যবস্থা নিতে হবে। পুলিশের সার্জেন্ট নিয়োগে প্রচলিত সরকারি দলীয় কর্মীর উপস্থিতি রোধ করে ছাত্রনেতাদের ভবিষ্যতে ফ্রাঙ্কেনস্টাইন হওয়া রোধ করতে হবে।

নিয়োগপ্রাপ্ত পুলিশ সদস্যদের মনো ও সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন কোর্সে এনে সুসেবক হওয়ার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দিতে হবে। এক্ষেত্রে একাডেমী ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা রাখতে হবে নিয়মিত।

প্রতিটি পুলিশ ক্যাম্পে পদস্থ কর্মকর্তার সঙ্গে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ যেমন– স্কুল শিক্ষক, মসজিদের ইমাম, প্রতিষ্ঠিত সৎ ব্যবসায়ী ও জনপ্রতিনিধিদের নিয়মিত মাসিক বৈঠক করা যেতে পারে যেখানে আলোচনা হবে মুক্তভাবে। পুলিশ বাহিনীর চাকরিকে আরও আকর্ষণীয় করতে তাদের সুযোগ-সুবিধাও বাড়াতে হবে। সীমান্ত প্রহরী ও সামরিক বাহিনীর সমপর্যায়ের বেতন-ভাতাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। তাতে তারা দুর্নীতির চেয়ে অধিক দায়িত্ববান ও চাকরির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে। জনসাধারণও পাবে উন্নত সেবা। এছাড়াও পুলিশ-বিডিআরের কাজের মধ্যে সুসমন্বয় সাধন করতে হবে সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে।

সর্বোপরি পুলিশ বাহিনীর কাজে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করে নিরপেক্ষ চেইন অব কমান্ড প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

md.ashrafuzzaman@unine.ch, md_ashrafuzzaman@yahoo.com

টো • কি • ও

বিশ্বের বয়স্কতম পুরুষ

গত ৪ জানুয়ারি বিশ্বের বয়স্কতম পুরুষ টোডে ইটালিতে পরলোকগমন করেন

১১৩ বছর বয়স্ক বিশ্বের শীর্ষ বয়স্ক এন্টনিও টোডে গত ৪ জানুয়ারি ইটালিতে পরলোকগমন করেন। গিনেস বুকস অব রেকর্ডে টোডে বিশ্বের দীর্ঘতম আয়ুর পুরুষ হিসেবে স্বীকৃত। ২০০০ সালে গিনেস সে সময়ের দীর্ঘ আয়ুর আমেরিকান বেঞ্জামিন হ্যারিসনের ১১১ বছরে মৃত্যুর পর টোডের নাম লিপিবদ্ধ করে। দীর্ঘজীবি মহিলা হিসেবে ১১৪ বছরে মাউদে ফারিসলুস-এর নাম রেকর্ড করেছে। ১৮৮৯ সালের ২২ জানুয়ারি টোডে ইটালির সারডিনিয়ার পাহাড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। টোডে জীবনে মাত্র একবার প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণের সময় এই আইল্যান্ডের বাইরে যান। ১১২তম জন্মদিনে তার দীর্ঘজীবনের গোপন কথা জানাতে তিনি বেশ কৌতুকময় মন্তব্য করেন। তার ভাষায়, ' Just love your brother and drink a good glass of wine every day ' তার ওয়েবসাইটে ক্লিক করলে দেখা যায় তিনি লম্বা জীবনের গোপনতম পন্থা সম্বন্ধে বলেছেন, 'You take one day after the other, you just go on.'

বয়স্কতম পুরুষ টোডে

ইয়াজদান হক ইনান, টোকিও, জাপান

হ্যা • মি • ল্ট • ন

মাউন্ট মাঙ্গানুই বিচ

প্রশান্ত মহাসাগরের সবুজ ডাল আর বিস্তীর্ণ বালিরাশি। এ এক অসাধারণ অনুভূতি...

প্রশান্ত মহাসাগরের মনোমুগ্ধকর বীচে লেখক

দিনটা ছিলো রৌদ্রোজ্জ্বল নিউজিল্যান্ড সামার সিজন। নিউজিল্যান্ডের সামার সিজনের একটা বৈশিষ্ট্য হলো নয়টা সাড়ে নয়টায় সন্ধ্যা হয়। আরেকটা বৈশিষ্ট্য, আবহাওয়ায় কোনো আর্দ্রতা থাকে না। ফলে রৌদ্রে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে চামড়া পুড়ে গিয়ে আমাদের ব্রাউন চেহারা কালো কুচকুচে হয়ে ওঠে। এমনই এক সামারের রৌদ্র জ্বলা দিনের সকালে নুরু ভাই, মিনু আপা ও তাদের দুই সন্তান মৌ-মীম অকল্যান্ড থেকে হ্যামিল্টনে আমার বাসায় এসে হাজির। এসেই আমাকে বাধ্য করলো মাউন্ট মাঙ্গানুই বিচে যেতে। আমার অবশ্য তেমন একটা ইচ্ছে ছিলো না। কারণ এর কিছুদিন আগে ২৩ জানুয়ারি আমি অস্ট্রেলিয়ার সিডনি থেকে ঘুরে এসেছি। মাউন্ট মাঙ্গানুই বিচ প্রশান্ত মহাসাগরের একটি বর্ধিত অংশ বে অব প্লেন্টির পাড় বেয়ে দীর্ঘতম বিচের একটা। তাওরাঙা সিটির কাছাকাছি মাউন্ট মাঙ্গানুই বিচকে কেন্দ্র করে মাউন্ট মাঙ্গানুই ছোট্ট একটা শহর গড়ে উঠেছে। বিচের পাশেই মাঙ্গানুই পাহাড়। পর্যটকদের মতে, পৃথিবীর সেরা দশটা বিচের একটা হলো মাউন্ট মাঙ্গানুই বিচ্। হ্যামিল্টন থেকে মাউন্ট মাঙ্গানুই বিচের দূরত্ব প্রায় ১২০ কিলোমিটার। আমরা যখন বিচে পৌঁছলাম, তখন সূর্যটা ঠিক মাথার ওপর। বিস্তীর্ণ চিক্ চিক্ বালি। শত শত লোক। কেউ প্রশান্ত মহাসাগরের সবুজ জলে সাঁতার কাটছে। কেউ সার্ফিং করছে। কেউ বা খানিকটা গভীরে স্পিডবোটে ভোঁ ভোঁ করছে। চিক্ চিক্ বালির ওপর নেট টানিয়ে যুবক-যুবতীরা দুই গ্রুপ হয়ে ভলিবল খেলছে। কেউ বা মিনি রাগবি টিম করে রৌদ্রের সৈকতে দৌড়াদৌড়ি করছে। মাউন্ড মাঙ্গানুই বিচে এসে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ হলো মিনু আপা। উনি খুবই ভ্রমণপ্রিয়। প্রকৃতিপ্রেমী মানুষ।

বিচের পাড় ধরে রাস্তা, রাস্তার পাশেই সারি সারি গাড়ি পার্ক করা। বহুতল ভবন, বিভিন্ন হোটেল, মোটেল, রেস্টুরেন্ট, ধনী লোকদের বসবাস। রাস্তার দু'পাশে সারি সারি পাম ট্রি। আর নিউজিল্যান্ডের সর্বত্রই তো যতটুকু বাড়ি-ঘর, দোকান পাট, শপিং সেন্টার, পাকা রাস্তাঘাট, আর বাকি সবই বিস্তীর্ণ জলরাশি, সবুজ ঘন গাছ আর ঘাসের বিস্তীর্ণ ভূমি। সবুজের যেন এতোটুকু ফাঁক নেই।

আমি বাদে মিনু আপা, নুরু ভাই, মৌ ও মীম সবাই প্রশান্ত মহাসাগরের ফেনিল ঢেউ আছড়ে পড়া বিচে সুইমিং করতে নামলো। বিচের সর্বত্রই জলে-স্থলে, বালুর ওপর অসংখ্য তরুণ-তরুণী, বিভিন্ন বয়সী, জোড়া কিংবা বিচ্ছিন্ন। আমি যেহেতু জলে নামবো না, সেহেতু আমার ওপর দায়িত্ব পড়লো ভিডিও করার। দেখতে ভালো লাগলো, নুরু ভাই এতোটা বয়স পেরিয়ে গিয়েও সমুদ্রের জলে নেমে কেমন এতোটুকু ছেলে হয়ে গেলো। ঢেউয়ের তালে তালে নাচতে থাকলো জলে। মিনু আপা অবশ্য হাঁটু জলে নেমে ছিল।

মাথার ওপর সেই খাড়া সূর্যটা আস্তে আস্তে পশ্চিমে হেলে পড়লো। হিম হিম বাতাস বইছিলো তখন ঢেউ ভাঙা স্রোত থেকে। রাস্তার দু' পাশের সারি সারি পাম ট্রিগুলো কাঁপছিলো তির তির করে।

সূর্যটা আরো খানিকটা হেলে পড়তেই ওরা সুইমিং শেষ করলো। চেইঞ্জিং রুম থেকে বেরিয়ে আমরা সবাই পাশাপাশি হাঁটছিলাম– সারি সারি গাড়ি, সারি সারি পাম ট্রি, রাস্তার পাশে নরম ঘাস। মিনু আপা হঠাৎ বললেন, আমার আগের জন্মের পূণ্য ছিলো তাই নিউজিল্যান্ডে এসেছিলাম। আমার মৃত্যুটা যেন নিউজিল্যান্ডে হয়।

নিউজিল্যান্ড স্বর্গভূমি এটা খুবই সত্য, কিন্তু নরম ঘাসের ওপর হাঁটতে হাঁটতে মিনু আপার কথা শুনে তখন নিজের বাংলাদেশটার কথা মনে পড়ে গেলো। কোটি কোটি লোকের ভারে নুয়ে পড়া সেই প্রিয় দেশটাতেই বা সবুজের কম কিসে!

মহিবুল আলম, 22B, Kitchenerst, Hamilton, New Zealand

টো • কি • ও

প্রবাসীর দেশ ভাবনা

কাজের ফাঁকে, অবসরে, পথ চলতে কখনও কখনও নিজের অলক্ষেই গানের কলি বেরিয়ে আসে 'ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা...'। স্বদেশপ্রেম মাপার যদি কোনো যন্ত্র থাকতো তবে নিঃসন্দেহে প্রবাসীদের দেশপ্রেমের পরিমাপটা তুলনামূলক বেশি হতো– প্রবাসজীবনে স্বজন ও স্বদেশ দুটোই সমানভাবে মনকে ব্যথাতুর করে তোলে। দেশ থেকে যোজন দূরত্বে থাকবার জন্যই দেশকে বারবার মনে পড়ে, স্বদেশের জন্য মনটা হয়ে ওঠে সিক্ত। দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির যে চরম অবনতি তা জেনে আমরা শিহরিত হয়ে উঠি। নিজেরা নিরাপদ দূরত্বে আছি বলেই যে নিস্তার তা কিন্তু নয়। কেন না, আমাদের পরিবার-পরিজনরা প্রতিনিয়ত সেই অরক্ষিত পরিবেশেই দিনযাপন করছে। শত প্রতিকূলতা কাটিয়েই তাদের প্রতিটি ক্ষণ দুঃসহ দুর্বিপাকের আবর্তেই কাটছে। এক বুক আশা নিয়েই আমরা স্বাধীনতাযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। শত ত্যাগ-তিতিক্ষার শেষেও আগামীর সম্ভাবনাই এই জাতিকে একত্রিত করতে সক্ষম হয়েছিল অথচ গুটিকতক রাজনৈতিক শঠ, প্রবঞ্চকের হাতে পড়ে সেই স্বপ্নের সলিল সমাধি হয়ে গেছে। ক্ষমতা আরোহণ আর অপসারণের দাবার ঘুঁটি হিসেবে আমরা ব্যবহৃত হয়েছি বারবার। অযোগ্য, লোভাতুর নেতৃত্ব, নিজস্বার্থে আমাদের দেয়ালের শেষপ্রান্তে সেঁটিয়ে দিয়েছে। বিন্দুমাত্র স্বদেশপ্রেমহীন এসব নেতৃত্ব দেশের হৃৎপিন্ডে অবস্থান করে আমাদের সুন্দর দেশটাকে নরকে পরিণত করেছে। সারা বিশ্বের আনাচে কানাচে ভাগ্যান্বেষণে প্রায় ত্রিশ লাখ প্রবাসী ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। প্রবাসীদের জন্য সরকারের বিন্দুমাত্র দায়িত্ব ও সদিচ্ছা নেই বোধগম্য কারণে। আশা করাও সময়ের অপচয় মাত্র। একজন তো আমাদের 'রাজাকারের বাচ্চা' সম্বোধন করেছেন আর একজন এবার সত্যসত্যই রাজকারের ঘোড়সওয়ার হয়েছেন। অতীতেও প্রবাসীরা তার কাছে কিছু পাননি এবারও তথৈবচ। এতো কিছুর পরও আমরা প্রবাসীরা দেশের জন্য উদ্‌গিরিত বুকের স্পন্দনকে থামাতে পারি না। কিছু করতে চাই। আমরা ব্যক্তি উদ্যোগে কিছু ব্যবস্থা নিতে পারি।

কাজী ইনসানুল হক, টোকিও,
insan@manchitro.net

কা • ও • য়া • সা • কি

প্রবাসীদের কল্যাণে

প্রবাস কল্যাণ মন্ত্রণালয় সারা দুনিয়া জুড়ে প্রবাসী বাংলাদেশীর প্রাণের দাবি ছিল

বর্তমান সরকার সম্প্রতি 'প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়' গঠন করেছেন। বিষয়টি চারদলীয় জোটের অন্যতম নির্বাচনী ইশ্‌তেহারও ছিল। দীর্ঘসূত্রতা সত্ত্বেও বাংলাদেশের বিরাজমান আর্থ সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে এ ধরনের একটি মন্ত্রণালয় গঠনের প্রয়োজনীয়তা সীমিত পরিসরে লিখে শেষ করা যাবে না। বর্তমান সাপ্তাহিক ২০০০ সম্পাদক শাহাদত চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক বিচিত্রা (অধুনালুপ্ত) পত্রিকাটি এ মন্ত্রণালয় গঠনের প্রেক্ষাপট তৈরিতে একটি মাইলফলক হিসেবে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রবাসী বাংলাদেশীরা যে জাতীয় অর্থনীতির একটি অফুরন্ত স্বর্ণভান্ডার তা তৎকালীন বিচিত্রাই দীর্ঘ অনেকগুলো বছর ধরে অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়। পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত দেশে দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য বাংলাদেশীর হাসি কান্না, বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা এবং জাতিগঠনের অভিনব ধারণা সে সময়ের প্রবাস থেকে বিভাগগুলোতে বিধৃত আছে। সেই একই ধারাবাহিকতায় 'সাপ্তাহিক ২০০০'-এর প্রবাস জীবন বিভাগটি এগিয়ে নিয়ে চলেছে। ঐ বিন্দু বিন্দু ধারণাগুলোর সমাহার বিকাশমান প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের রূপরেখার সিন্ধু হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এ মন্ত্রণালয় গঠনের ব্যাপারে জাপান প্রবাসী বাংলাদেশীরা পাইওনিয়ারের ভূমিকা পালন করে। এ লেখকের সম্পাদনায় টোকিও থেকে প্রকাশিত মাসিক 'প্রবাসকণ্ঠ' নবেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৯২ প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে আমরাই সর্বপ্রথম এ ধরনের মন্ত্রণালয় গঠনের সুপারিশ করি এবং প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে জাপান সফরের আহ্বান জানাই। পরবর্তী সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাপান সফরে এলে এ বিষয়ে আমরা তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনার সুযোগ লাভ করি এবং সুনির্দিষ্ট রূপরেখা তুলে ধরি।

প্রবাসীদের স্বার্থে প্রথমেই প্রয়োজন তাদের ভোট প্রদানের অধিকারটা নিশ্চিত করা। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এক সময় ঘোষণা দিয়েছিলেন, প্রবাসে বসে ভোট দেয়া যাবে। পরবর্তীতে আপন ব্যর্থতা ও কুশাসনের বদৌলতে প্রবাসীদের রুদ্ররোষের উত্তাপ টের পেয়ে বেফাঁস বলে ফেলেন– প্রবাসীদের ভোটাধিকার দেয়া হলে রাজাকারের বাচ্চারা ভোট প্রদানের সুযোগ পাবে। তাতে করে দলীয় কর্মীসহ সমগ্র প্রবাসী কমিউনিটি চরমভাবে আহত হয়েছে। এ ব্যাপারে বর্তমান সরকারের অবস্থান এখনই সুস্পষ্ট করতে হবে। প্রবাসীরা চিরচেনা স্বদেশ-আপনজনকে পেছনে ফেলে এসে অজানা-অচেনা বৈরী পরিবেশে অমানুষিক শ্রম দিয়ে অর্থনীতির চাকাকে সচল রেখেছে। তাই প্রবাসীদেরকে নিয়ে নোংরা রাজনীতি ও ভোটের রাজনীতি অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। বাংলাদেশের একটি প্রচলিত প্রবাদ– 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধানই ভানে'। বাংলাদেশের মানুষ বিদেশে পাড়ি জমানোর পাশাপাশি সঙ্গে করে নিয়ে যায় কোন্দল-হানাহানি-পরচর্চা এবং সংকীর্ণ রাজনৈতিক দলাদলি। যে দেশেই বাংলাদেশী থাক না কেন, সেখানে নেতা-কর্মী বা একাধিক কমিটি না থাকাটা যেন মহা অগৌরবের ব্যাপার! সেই সূত্রে চাঁদাবাজির হাতটাও স্বদেশের গন্ডি ছাড়িয়ে সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপার পর্যন্ত বিস্তৃতি পেয়েছে। জীবনহানির ঘটনাও ঘটছে অহরহ, যার সূত্র ধরে নিরীহ শ্রমজীবীদের দেশে ফিরে যেতে হচ্ছে। নোংরা রাজনীতির দুর্গন্ধময় জঞ্জাল বাইরে রপ্তানি বন্ধ করতে পারলে প্রবাসীরা অধিকতর সুনাম ও দক্ষতার সঙ্গে বৈদেশিক মুদ্রার ভান্ডারটা সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হবে। ভোটের রাজনীতি নয়– দেশ ও জনগণের স্বার্থে কাজ করে গেলে ভোট ভিক্ষা চাইতে হবে না।

M. A. Subhan, Kawasaki, Japan

রি • য়া • দ

পৌষ উৎসব

সৌদি আরবের কঠোর আইন তবুও থেমে থাকে না পৌষ উৎসব

পৌষ মাস এলে সাহিত্যমনা বাঙালির হৃদয়ে উথাল-পাতাল হয় নস্টালজিয়া। সেই নস্টালজিয়ার ভারে অজান্তেই সাহিত্যমনাদের চিন্তা-ভাবনার প্রসার ঘটে। অতঃপর অপলক চোখ আর আবেগী মন সাজ নেয় বিমূর্ত ছন্দ সৃষ্টিতে। রিনঝিনিয়ে ওঠে তার চারিধার। এই অবধারিত সত্যের আষ্টেপৃষ্ঠে সহস্র বছর বাঙালি বাঁধা আছে বিধায় বিশ্বের যেখানে আছে তারা সেখানেই নেমে এসেছে উৎসবের কথকতা। কঠোর আইনের দেশ সৌদি আরবেও থেমে নেই তার ধারা। পৌষ এলেই রিয়াদ সাহিত্যাঙ্গনে শুরু হয়ে যায় পৌষ পালনের মহোৎসব। বিশ্ব রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে এবার ঘটা করে তা পালন না হলেও বাংলা রাইটার্স ফোরাম আল মরুজ কমপাউন্ড মিলনায়তনে আয়োজন করে এক পৌষ উৎসবের। এই অনুষ্ঠানে বাংলা রাইটার্স ফোরাম-এর পক্ষ থেকে

দেশের গান গাইছেন সুরভা

সাহিত্যপত্র রাইটার্সের সম্পাদক শাহ্‌জাহান চঞ্চল ও তার সহধর্মিনী বিভাগীয় সম্পাদক মিসেস সানজিদা চঞ্চল সৌদি আরবের দাম্মাম প্রদেশে বসবাসরত কবি ও এক সময়ের বাংলাদেশ বেতারের লিস্টেড গীতিকার সৈয়দ আমিনুল ইসলামকে সংবর্ধনা প্রদান করেন। সংবর্ধনা শেষে রিয়াদের উদীয়মান আবৃত্তিকার ও কণ্ঠশিল্পীদের মাধ্যমে আয়োজন করা হয় এক রাতভর পৌষ সংস্কৃতির সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের।

আমিনুর রহমান
রিয়াদ- সৌদি আরব

দূরদেশ

ম • ক্কা

পবিত্র হেরেম শরিফে ঈদ

পুণ্যভূমি মক্কা। পবিত্র হেরেম শরিফে নামাজ পড়ার জন্য পূর্বরাত থেকেই চলে প্রস্তুতি

ঈদ মানে তো আনন্দ-খুশি। কিন্তু প্রবাসীদের ঈদ আনন্দে যেন পরিপূর্ণতা আসে না। কিসের যেন একটা অভাব অনুভব হয়। মা-বাবা, ভাইবোন, আত্মীয়, প্রিয়জন এ খুশির দিনে থাকে অনেক দূরে। ক্ষণিকের জন্য হলেও মন ছুটে যায় ফেলে আসা দূর স্বদেশভূমে। স্বদেশ আর স্বজাতীয় সংস্কৃতির আবহে ঈদ উদ্‌যাপনের স্মৃতিগুলো মনের পর্দায় একে একে ভেসে ওঠে।

এবারের ঈদ নিয়ে রমজানের চারটি ঈদ উদ্‌যাপন করা হলো পবিত্র মক্কায়। পবিত্র কাবা ঘরের সন্নিকটে অবস্থানের কারণে চারটি ঈদের জামাতই পড়েছি মসজিদুল হেরেমে। এটা আমার জীবনের স্মরণীয় মুহূর্ত হিসেবে আজীবন মূর্ত হয়ে থাকবে। এখানে উল্লেখ্য, ঈদুল আজহার নামাজগুলো পড়তে পারিনি। কারণ ঈদুল আজহার নামাজ অনুষ্ঠিত হয় জিলহজ মাসের দশ তারিখে। হজ সম্পন্ন করার কারণে কোনো হাজিই ঈদের নামাজ পড়েন না, তাদের পড়তে হয় না। ঐদিন অর্থাৎ জিলহজ মাসের দশ তারিখে সব হাজি মুজদালিফা থেকে মিনায় এসে 'জুমারাতুল আকাবা' বা বড় শয়তানকে পাথর মারে এবং কোরবানি সম্পন্ন করে। এটা হজের অন্যতম অংশ। পবিত্র মক্কায় ঈদের আনন্দ উদ্‌যাপন হয় একটু ব্যতিক্রমভাবে। বাংলাদেশের মতো এখানে হৈ-হুল্লোড় কিংবা এতো চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয় না। রমজানের এক মাসের আনন্দের সঙ্গে ঈদ আনন্দ যেন একাকার হয়ে যায়। আনুষ্ঠানিকতার চেয়ে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যটাই বেশি দেখা যায়। তবে রাস্তার মোড়, বড় বড় মার্কেট, ইমারত– এগুলো নানা রঙে আলোকসজ্জিত করা হয়। সৌদিরা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি অনুযায়ী ঈদ উৎসব পালন করে থাকে। অবশ্য ঈদের দিনেও অধিকাংশ প্রবাসীকে ডিউটি করতে হয়।

ভোর চারটায় ঘুম থেকে উঠে গোসল সেরে প্রস্তুতি নেই পবিত্র হেরেম শরিফে যাওয়ার জন্য। কারণ, একটু দেরি হলে মসজিদুল হেরেমের ভেতরে জায়গা পাওয়া কষ্টকর হয়ে পড়বে বলেই আগে থেকে এ প্রস্তুতি। নাজরান (এ দেশের একটি বড় জেলা) থেকে আসা আমার এক ক্লাসমেট বাবুল, আমার রুমমেট পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক আইনুল হক এবং চট্টগ্রামের জসিম মিজি ভাইও প্রস্তুতি নেয়। মিষ্টি খেয়ে দ্রুত আমাদের কোম্পানির গেটে যাই গাড়ি ধরার জন্য। কিন্তু গাড়ি নেই। অনেক কষ্টে একটি পিকআপে চড়ি। রাতের স্তব্ধতা ভেঙে সবাই ছুটছে হারাম শরিফে। পাহাড়ঘেরা মক্কার প্রকৃতির দিকে তাকালাম। সমস্ত প্রকৃতি যেন ঈদের আনন্দে আনন্দিত। চারদিকে খুশির হাওয়া বইছে। রাস্তায় গাড়ির বহর ছুটছে হারামের দিকে। আনন্দে সবাই আত্মহারা। হেরেম শরিফের বেশ খানিক দূরে পুলিশ রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়ে রেখেছে, যাতে গাড়ি সামনে না যায়। যানজট এড়ানোর জন্যে এ ব্যবস্থা। মেছফালাহ ওভারব্রিজের কাছে গাড়ি থেকে নেমে প্রবহমান জনস্রোতের সঙ্গে হাঁটতে লাগলাম। নারী-পুরুষ-শিশু সবাই ছুটছে হারামের দিকে– বিভিন্ন দেশের, নানা বর্ণের, নানা রঙের মানুষ। সাদা-কালোয় আজ নেই কোনো ভেদাভেদ। উঁচু-নিচুতে পার্থক্য নেই। ধনী-গরিবে নেই কোনো ফারাক। সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য আর আনন্দে সবাই একাকার। হাতে হাত রেখে গলাগলি-ঢলাঢলি করে ছুটছে সবাই এক আল্লাহর রাহে। হেরেম শরিফে ঢোকার পূর্ব মুহূর্তে জসিম ভাই জনস্রোতে হারিয়ে গেল। চারদিকে তাকিয়ে দেখি মানুষ আর মানুষ। চলমান মানব স্রোত ধেয়ে আসছে। সামনে পা ফেলার যায়গা নেই। মনে মনে ভাবলাম ভেতরে প্রবেশ করা হয়তো বা অসম্ভব। একটা জনস্রোতে মিশে অতি কষ্টে সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগলাম। প্রচন্ড চাপে শ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম। অনেক কষ্টে বাদশা ফাহাদ বিন আব্দুল আজিজ গেট দিয়ে দোতলায় উঠলাম। ইচ্ছা ছিল ছাদে যাব কিন্তু ভিড়ের প্রচন্ডতার কারণে তা আর হলো না। ইতিমধ্যে হেরেম শরিফের চারদিক কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেছে। কাবা ঘরের চারদিক, মসজিদুল হারামের নিচতলা, দোতলা, ছাদ এবং বাইরের বিস্তৃত মাঠ কোথাও তিল ধারণের ঠাঁই নেই। এখন যারা আসছে তারা আশপাশের রাস্তা, বড় বড় বিল্ডিংয়ের ছাদে কিংবা পাহাড়ের চূড়ায় বসে নামাজ পড়তে হবে। মাইকে মুয়াজ্জিন ফজরের আজান দিল। ফজরের নামাজ শেষে সবাই উচ্চস্বরে তাকবির পড়ছে। মাইকে মুয়াজ্জিন তাকবিরের শব্দগুলো উচ্চারণ করছে। আর সবাই তার সঙ্গে সঙ্গে পড়ছে। ঈদের জামাতের এখনও অনেক দেরি। এদিকে পূর্বাকাশে সকালের সূর্য আস্তে আস্তে লাল আভা ছড়িয়ে দিচ্ছে চারদিকে। সূর্যরশ্মি যেন আল্লাহর রহমত হয়ে ঠিকরে পড়ছে পাহাড়ঘেরা মক্কার পবিত্র ভূমিতে। মৃদুমন্দ ঠান্ডা বাতাসে চারদিক থেকে ভেসে আসছে সুগন্ধী। শরীর-প্রাণে এক অনাবিল বেহেস্তি সুখ অনুভব করছি। নিকট অতীতের ফেলে আসা অনেক ঈদের তুলনা করছি আজকের এই বিরল মুহূর্তটিকে। ভাবছি পবিত্র এ কাবাঘরকে সামনে নিয়ে এভাবে ঈদের জামাত পড়ার মহাসৌভাগ্যের কথা। আরো ভাবছি বাংলাদেশে নিজের আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয়জনদের ঈদ আনন্দের কথা। সকাল ৭টা ২০ মিনিট। শুরু হলো ঈদের নামাজ। কাবা শরীফের প্রধান ইমামের ইমামতিতে নাজাম শেষ হলো। নামাজ শেষে তিনি খুৎবা পড়তে লাগলেন। সবাই মনোযোগ দিয়ে খুৎবা শুনছে। শেষ খুৎবায় তিনি সারা বিশ্বের নির্যাতিত মুসলিমদের জন্য দোয়া করলেন। সেই সঙ্গে সমগ্র মুসলিম উম্মাহর শান্তি, সমৃদ্ধি, অগ্রগতির জন্যও আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন। জীবনের অনেক স্মরণীয় মুহূর্তের মধ্যে আজকের এই আনন্দঘন মুহূর্তটি আমার জীবনে প্রোজ্জ্বল হয়ে থাকবে। ভুলতে পারবো না প্রিয় রসুল (সঃ)-এর জন্মভূমি আর কাবা ঘর যেখানে-সেখানে নামাজ পড়ার মতো সুযোগ দান করার জন্য আল্লাহর অনুগ্রহকে।

Md. Hazinur Rahman Shahin, Water Treatment Plant, Dallah Establishment, Post Box no- 5800, Holy Makkah, K.S.A

টো • কি • ও

বিশ্বকাপের ট্রফি

বিশ্বকাপ ট্রফিটি এখন সারা বিশ্বেই আগ্রহের বিষয়

কেমন দেখতে আসন্ন বিশ্বকাপ ফাইনালের ট্রফিটি! এই একটি ট্রফির জন্য সারা বিশ্বে এতো প্রতিযোগিতা, এতো আয়োজন। কার ভাগ্যে আছে এই মূল্যবান ট্রফিটি ছুঁয়ে দেখবার সৌভাগ্য, চুমু দেবার অধিকার। টোকিওর বিশ্বকাপ পর্যটকদের একটি কেন্দ্রে এখন এটি প্রদর্শিত হচ্ছে। এখান থেকে যাবে কোরিয়ায়। ছবিতে দেখুন গভীর বিস্ময়ে পিতা-পুত্র দেখছেন সেই মহামূল্যবান ট্রফিটি।

ইয়াজদান হক ইনান, টোকিও, জাপান

বিশ্বকাপের ট্রফি দেখছে পিতা ও শিশু